মার্কসীয় দর্শন

 মার্কসবাদ- শোষণ মুক্তির মতবাদ↔

মানবসমাজের বিকাশ ধারার অনুশীলনকে বিজ্ঞানে উন্নীত করার কৃতিত্ব মার্কসবাদের। শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত সমৃদ্ধ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার পথের সন্ধান দিয়েছে মার্কসবাদ। এটাই মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যৌথভাবে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। আজ যেমন আমরা দেখছি মার্কসবাদকে অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ করার লাগাতার প্রয়াস — এটা নতুন কিছু নয়। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এই প্রচেষ্টা চলছে। কার্ল মার্কসের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধে কমরেড লেনিন বলেছিলেন — ‘‘সভ্য দুনিয়ার সর্বত্র বুর্জোয়া বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে মার্কসের মতবাদের প্রতি চূড়ান্ত শত্রুতা ও আক্রোশ দেখা যায়।’’ এই সমস্ত আক্রমণের মোকাবিলা করেই মার্কসবাদ অগ্রসর হয়েছে।
উনিশ শতকে মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে যেগুলি বর্ণিত হতো তার অন্যতম ছিল যথাক্রমে জার্মান দর্শন, ইংরেজি অর্থশাস্ত্র ও ফরাসি সমাজবাদ। এই তিনটি ছিল মার্কসবাদের উৎস। এই সময়ে দর্শনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ লক্ষিত হয়েছিল জার্মান দর্শনে। একদিকে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও অপরদিকে ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মধ্য দিয়ে জার্মানিতে বস্তুবাদের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল।
আবার, মার্কসবাদের তিনটি উপাদান। তিনটি উপাদান হলো যথাক্রমে মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় অর্থনীতি ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব। এই তিনটি উপাদানকে নিয়েই মার্কসবাদ। মার্কসবাদকে উপলব্ধি করতে হলে মার্কসীয় দর্শনকে জানতে হবে। মার্কসীয় দর্শনই হলো মতবাদের ভিত্তি। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হলো মার্কসীয় দর্শন। মানবসমাজের বিকাশের অনুসন্ধানে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদই হলো মার্কসীয় দর্শন।

 দর্শন কি?↔
‘দৃশ্‌’ ধাতু থেকে দর্শন শব্দটি এসেছে। দর্শন শব্দের অর্থ দেখা। নিজের চারপাশকে ভালো করে দেখাই হল দর্শন। ইংরাজি ‘Philosophy’ (ফিলোজোফি) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো দর্শন। এর উৎস হলো দুইটি গ্রীক শব্দ যথাক্রমে ‘Philos’ (ফিলোস) ও ‘Sophia’ (সোফিয়া)। এই দুইটি শব্দর অর্থ হলো জ্ঞান ও ভালোবাসা। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা।
নিজের চারপাশকে ভালো করে দেখা — এটা সমস্ত সচেতন মানুষই করেন। দর্শন জ‍‌ড়িয়ে রয়েছে সমস্ত মানুষের জীবনে।
দর্শন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছে — যা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। দর্শনের চর্চায় মানুষের মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠায় যারা ‌আশঙ্কিত এটা তারাই করেছেন।
 সমস্ত সচেতন মানুষেরই দর্শন রয়েছে। অধিকাংশেই অচেতন দার্শনিক। মার্কসবাদ চায় সকলকে সচেতন দার্শনিকে পরিণত করতে।λ
 দর্শনের অন্তর্বস্তু — প্রকৃতি জগত, মানবসমা‍‌জ ও চেতনার আন্তঃসম্পর্কই হলো দর্শনের মূল অন্তর্বস্তু।λ
 দর্শনের বিষয়বস্তু — প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ নিয়ম ও সূত্র রয়েছে। এই সাধারণ নিয়ম ও সূত্রগুলির চর্চাই দর্শনের বিষয়বস্তু গড়ে তোলে।λ
দর্শন প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস— “Every true philosophy is the intellectual quintessence of its time.” প্রতিটি প্রকৃত দর্শন হলো সেই যুগের বুদ্ধিগত বিকাশের সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অঙ্গ।’’
বহু প্রাচীনকাল থেকে মানবসমাজে দর্শনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, চীনের সঙ্গে ভারতে‍‌ও বহু প্রাচীনকাল থেকে দর্শনের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাচীন যুগে গ্রীসেও দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন যুগে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অস্তিত্ব ছিল না। যে কোনো ধরনের জ্ঞানচর্চাকেই দর্শন বলে অভিহিত করা হ‍‍তো।
 দর্শন কিন্তু শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। হয় শোষক বা শোষিত কোনো না কোনো শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার লক্ষ্য নিয়েই দর্শন অগ্রসর হয়েছে। দর্শন সবসময়ই হলো শ্রেণী দর্শন। হয় শোষণ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য, অথবা শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের শক্তিকে উৎসাহিত করে দর্শন।λ
λ  আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন হিসাবে মার্কসীয় দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে।

 দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ↔
দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রকৃতি জগত ও তার ঘটনাবলীকে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। সাথে সাথে এই দর্শন প্রকৃতি জগত ও তার ঘটনাবলীকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার করে। ‘Dialego’ শব্দটি থেকে ‘Dialectical’ শব্দটি এসেছে। প্রাচীনকালে বিশ্বাস ছিল, চিন্তাধারার অভ্যন্তরের স্ববিরোধগুলি উন্মোচন করা এবং পরস্পরবিরোধী মতের সংঘাতের মধ্য দিয়েই সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।
দ্বান্দ্বিকতার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে জার্মান দার্শনিক হেগেলের অনস্বীকার্য। সমস্ত কিছুকে গতির ধারায় দেখতে হবে। গতি ও তজ্জনিত পরিবর্তনের ভিত্তিতে সমস্ত কিছুকে বিচার করতে হবে। এইভাবেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে হেগেল তুলে ধরলেন।
হেগেলের দর্শনের যে সীমাবদ্ধতা তা দেখালেন মার্কস ও এঙ্গেলস। সেখানে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সাথে বস্তুবাদ নয়, ভাববাদের সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল।। মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে ভাববাদের থেকে মুক্ত করে তাকে বস্তুবাদের সঙ্গে যুক্ত করলেন।

 দর্শনের দুইটি ধারা↔
দর্শনের দুইটি মূল ধারা। বস্তু ও চেতনার সম্পর্কের প্রশ্নকে ঘিরে দুই ভাগ। বস্তু না চেতনা কোনটা আগে, কোনটা আদি। কোনটা মুখ্য।
বস্তুবাদী দর্শন — বস্তুই আদি, মুখ্য ও সত্য। বস্তুর বিকাশের ধারায় চেতনার উদ্ভব।
ভাববাদী দর্শন — ভাব বা চেতনাই আদি। মুখ্য ও সত্য। চেতনার ইচ্ছা অনুসারেই বস্তু গড়ে উঠেছে।
আর একটি মূল প্রশ্ন, বস্তুকে কি জানা সম্ভব? এক্ষেত্রে গুরুতর পার্থক্য- বিতর্ক।
ভাববাদী দর্শন — প্রকৃতি জগতের সমস্ত কার্যধারাকে অতীন্দ্রিয় শক্তির কার্যধারা হিসাবে বর্ণনা করেছে। ভাববাদী দর্শনকে আশ্রয় করেই ঈশ্বর চিন্তা গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি ভাববাদ।
 বস্তুবাদী দর্শন— বস্তুই আদি, মুখ্য ও সত্য এবং বস্তুর বিকাশের স্তরেই চেতনার উদ্ভব, এই‍‌ হলো বস্তবাদী দর্শনের মূল বক্তব্য। মানবসভ্যতার বিকাশের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বস্তুবাদী দর্শনের ক্রমান্বয়ে বিকাশ ঘটেছে। বস্তুবাদ একটি নির্দি‍‌ষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট প‍‌দক্ষেপ গ্রহণ করার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হলো বস্তুবাদ। মানুষের সামাজিক সত্ত্বাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। বস্তুকে আশ্রয় করেই চেতনা গড়ে ওঠে।λ
বস্তুবাদী দর্শন ঈশ্বর নামক কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব বাতিল করে। বস্তু তার নানারূপে অনাদিকাল ধরে বিরাজ করছে — তাই এর সৃষ্টি বা স্রষ্টার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। সচেতন বস্তু — মানুষ। মানুষের চিন্তা, আবেগ, আদর্শ ও চাহিদাগুলি গড়ে ওঠে জীব হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের ধারায় এবং এই পৃথিবী গ্রহে অন্য জীবগুলির সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে। যে কোন সময়ের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই চিন্তা, আবেগ, আদর্শ ও চাহিদাগুলি গড়ে ওঠে।
 বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বিকশিত হয়েছে। বস্তুবাদ পুষ্ট হয়েছে। একদিকে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে চলেছে। বহু দূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্র, পালসার, গ্রহ, উপগ্রহ সম্পর্কে আমরা জানতে সক্ষম হচ্ছি। নতুন তথ্য পাওয়ার মত ঘটনা ঘটেই চলেছে। বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপের নতুন নতুনλ  সন্ধানও আমরা পাচ্ছি। কণা ও তরঙ্গের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ক্রমাগত উন্নততর হচ্ছে। বস্তু সম্পর্কে ধারণার বিকাশ ঘটছে। বস্তুজগতের  অসীমতা সম্পর্কে অনুধাবন করা কিছুটা হলেও সম্ভব হচ্ছে।
 বস্তুবাদের বিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ, যান্ত্রিক বস্তুবাদ অধিবিদ্যক বস্তুবাদের স্তর অতিক্রম করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই ধারাতেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উদ্ভব ঘটেছে।λ
দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আবির্ভাব ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিস্ময়কার অগ্রগতি এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বিশেষ করে তিনটি আবিষ্কার—
(১) শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তরের তত্ত্ব।
(২) কোষ বিভাজনের তত্ত্ব।
(৩) ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব।
বস্তুজগতের বিকাশ ধারাকে অনুধাবন করা সম্ভব হলো। বস্তুবাদ সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করলো। বিকাশের সর্বাঙ্গীন সুগভীর মতবাদ হিসাবেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পত্তন ঘটলো।
‘‘বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীনী, সবচেয়ে বিষয় সমৃদ্ধ ও সবচেয়ে সুগভীর  তত্ত্ব।’’ (লেনিন)
‘‘একটি সমগ্রকে খণ্ডিত করা এবং এর পরস্পর বিরোধী অংশকে জানাই হলো দ্বান্দ্বিকতার মর্মবস্তু।’’ (লেনিন)
দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে যখন মানবসমাজের বিকাশ ধারার অনুসন্ধানের নিমিত্তে প্রয়োগ করা হয় তাকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কসীয় দর্শন বলতে বোঝায় দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।
বস্তুবাদী দর্শন সবসময়ে শোষিতশ্রেণীর দর্শন হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বাধিক শোষিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন হিসাবে ভূমিকা পালন করছে।
বস্তু বলতে কি বোঝায়? আমাদের চারপা‍শে যা কিছু সমস্ত কিছুই বস্তু। মানুষসহ সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ জগৎ বস্তুজগতের অন্তর্গত। নদ-নদী, সাগর-পাহাড় আমাদের পৃথিবী, সূর্য, সমগ্র সৌরজগৎ সবই বস্তু, ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী সবই বস্তু। খালি চোখে ধরা পড়ে না — ইলেকট্রন, প্রোটন, পরমাণু সবই বস্তু। শক্তিও বস্তু। ঘটনাবলীও বস্তু।
বস্তু একটি দার্শনিক সংজ্ঞা — যার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে, যা আমাদের চেতনা নিরপেক্ষ এবং চেতনায় প্রতিফলিত হতে পারে তাই হলো বস্তু।

 বস্তু সর্বদাই গতির মধ্যে বিরাজ করছে↔
বস্তুর অস্তিত্বের রূপ হলো গতি। বস্তু সর্বদাই গতির মধ্যে বিরাজ করছে। স্থির হলো আপেক্ষিক। গতির দ্রুততর হওয়া — বস্তুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। স্থিরতাও গতির একটি রূপ।

 প্রাণ↔
বস্তুর বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ হলো প্রাণ। এই পৃথিবীতে জড় পদার্থ থেকেই বিকাশের ধারায় প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রায় ৩৫০-৩৭০ কোটি বছর এই পৃথিবীতে পূর্বে প্রাণের আবির্ভাব। প্রাণের বিবর্তনের ধারায় মানুষ। প্রায় ২৫ লক্ষ বছর পূর্বে অস্ট্রালোপিথেকাসদের তৈরি পাথরের হাতিয়ারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় ৬০লক্ষ বছর পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম এমন বানর (APES)–দের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে যাদের থেকে আধুনিক মানুষের উদ্ভব।

 চেতনা↔
মস্তিষ্কের কার্যধারার ফল হলো চেতনা ও চিন্তা। মস্তিষ্ক হলো বস্তুর সর্বাপেক্ষা সংগঠিত ও সর্বোচ্চ রূপ। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জেনেছি কিভাবে মানব মস্তিষ্ক কাজ করে।
বহির্জগতের বাস্তবতা এবং মস্তিষ্কে তার প্রতিফলন — এই আন্তঃসম্পর্কেই মানবচেতনার ভিত্তি। মস্তিষ্ক ব্যতিরেকে কোনো ধারণা, চিন্তা কিছুই গড়ে উঠতে পারে না।
চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া। বাস্তবকে ভিতি করেই জ্ঞান।

  দ্বান্দ্বিকতার মূল দিকগুলি↔
 দ্বন্দ্বতত্ত্ব— বিকাশের তত্ত্ব।λ
বস্তু সর্বদা গতিশীল। বস্তুছাড়া গতি হয় না। শুধুমাত্র যান্ত্রিক গতি নয়। গতির অর্থ সমস্ত ধরনের ক্রিয়া। গতির ফলেই পরিবর্তন। সমস্ত কিছুই পরিবর্তনের ধারায় বিরাজ করছে। স্থায়ী বা চূড়ান্ত বলে কোনো কিছু নেই। গতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সমস্ত কিছুকে বুঝতে হবে। বিশ্ব হলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সম্মিলিত রূপ। বিকাশ ও অবসানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছে। কোনো কিছুই চিরন্তন নয়। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সমস্ত ঘটনাকে এবং তার বিকাশকে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে না দেখতে পারলে গুরুতর ভ্রান্তি ঘটবে। পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখতে পারলে পৃথিবীর উদ্ভব ও প্রাণের উদ্ভব বিকাশকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

 দ্বন্দ্বতত্ত্ব-সার্বিক সম্পর্কের তত্ত্ব↔
সমস্ত বস্তু ও ঘটনা এবং প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কিত এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কিছুকে বিচার করলে তা হবে চরম ভ্রান্তি।
ধূলোকণা ও গ্যাসীয় মেঘ যান্ত্রিক গতির ফলে নিকটবর্তী হয়। উদ্ভব ঘটল তাপ ও চাপ-পদার্থিক গতি। অর্থাৎ যান্ত্রিক গতির ফলে পদার্থিক গতি। শুধুমাত্র পদার্থিক গতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে তার উৎস ও বিকাশকে অনুধাবন করা যাবে না। এভাবেই সৃষ্টি হল পৃথিবী।
রাসায়নিক বিকাশ (জলের মধ্যে) সৃষ্টি করলো প্রাণ। প্রাণের বিবর্তন (জৈবিক গতি তথা বিকাশ) মানুষের আবির্ভাব সম্ভব করল। বিকাশই বস্তুজগতের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। সমগ্র বস্তুজগৎ এবং পরস্পর সম্পর্কও একটি অখণ্ড সমগ্র বটে।
পারস্পরিক সম্পর্ক একমুখী নয়, বহুমুখী। সার্বজনীন-নির্দিষ্ট, রূপ-অন্তর্বস্তু, সম্ভাব্য-বাস্তব, আপাত-প্রকৃত প্রভৃতি।
 বিকাশের মূল নিয়ম↔
দ্বান্দ্বিকতা সমস্ত কিছুকে বিকাশের মধ্যে দেখে। কোনোকিছুই স্থির নয়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে অতি বৃহৎ বস্তু সমস্ত কিছুই বিকাশের ধারায় বিরাজ করছে। যে গতির ফলে পরিবর্তন এবং বিকাশ, সেই গতি কোথা থেকে আসে বা সৃষ্টি হয়? বিকাশের ধারা কিভাবে পরিচালিত হয়? বিকাশের অভিমুখ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই বিকাশের নিয়মগুলির দ্বারা। তিনটি মূল নিয়ম।
বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম- সমগ্র বস্তু ও ঘটনার মধ্যে বৈপরীত্য বিরাজ করছে। এই বৈপরীত্যের সংঘাত থেকেই গতির সৃষ্টি হয়। বিপরীতের এই সংঘাতকেই বলে দ্বন্দ্ব (Contradiction)। ঐক্য সাময়িক।
ধনাত্মক — ঋণাত্মক
পজিট্রন — ইলেকট্রন
বিশ্লেষণ — সংশ্লেষণ
যোগ — বিয়োগ
শোষিত — শোষক
পুঁজিপতি — শ্রমিক
জমিদার — কৃষক
দ্বন্দ্বের নানা রূপ—
 অপ্রধান ও প্রধান দ্বন্দ্বλ
 মুখ্য ও কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব—বিশ্বের ক্ষেত্রে, ভারতের ক্ষেত্রে।λ
 বৈরী ও অবৈরী দ্বন্দ্ব। সমাধানের পদ্ধতি ভিন্ন।λ
 বহিস্থ ও অন্তস্থদ্বন্দ্ব।λ

 পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটে পরিবর্তনের ধারা প্রথমে হয় পরিমাণের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। পরিমাণগত পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছলে গুণগত রূপান্তর হয়। পরিবর্তন দ্রুত। গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বস্তু ও ঘটনা নতুনλ  স্তরে উন্নীত হয়।
জল থেকে বাষ্প, জল থেকে বরফ।
গ্যাসীয় অবস্থা — তরল অবস্থা — কঠিন অবস্থা।
সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদ হলো গুণগত রূপান্তর। শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ-আন্দোলন-পরিমাণগত পরিবর্তন-এর বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের গুণগত পরিবর্তন।
পূর্বেকার পর্যায়ের যা কিছু ইতিবাচক বিকাশশীল, প্রগতিশীল সেগুলি গুণগত নতুন পর্যায়ে সংরক্ষিত হবে।
 নেতির নেতিকরণের মধ্য দিয়ে বিকাশλ
নিরন্তর নেতির মধ্য দিয়েই বিকাশের ধারা অগ্রসর হচ্ছে।
নেতির নেতিকরণ প্রকৃতি জগতে।
নেতির নেতিকরণ মানবসমাজে।
বিকাশের ধারা সরলরেখা নয়। সর্পিল আকারে।
নেতির নেতিকরণের অর্থ হলো—
(১) বিকাশের ধারাবাহিকতা;
(২) বিকাশ প্রগতির দিকে;
(৩) চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি হয় তবে উন্নতর স্তরে।

 ঐতিহাসিক বস্তুবাদ↔
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতিগুলির প্রয়োগ মানব ইতিহাসের অনুসন্ধানের নিমিত্তে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিষয়বস্তু হলো সমাজ বিকাশের নিয়মগুলিকে জানা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুশীলন করা হয় উপলব্ধির স্বচ্ছতার জন্য।
সমাজবিজ্ঞানের নিয়মগুলির ক্ষেত্রে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করল যে, সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও চালিকাশক্তির সন্ধান করতে হবে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাগের মধ্যে এবং এই সব শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে। রাষ্ট্র, চেতনা, ধর্ম, দর্শন, মূল্যবোধ এই সমস্ত কিছুর উৎসমূলে উৎপাদন পদ্ধতি।

 বস্তুজগতের নিয়মগুলি সামাজিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে↔
বস্তু বা ঘটনা বস্তুজগতের নিয়মের অধীন। এই নিয়ম আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।
সামাজিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে সমাজের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়—
(১) সমাজের কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। প্রত্যেকটি ঘটনা অপর ঘটনার ওপর নির্ভরশীল ও পরস্পর সম্পর্কিত। উপযোগী সময় দেখা দিলেই সমাজে কোনো ঘটনা ঘটে। কোনো ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে চলবে না।
(২) সমাজে কোনো একটি ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তা জনগণের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই পরবর্তী ঘটনার পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করতে থাকে এবং পরবর্তী ঘটনাকে ঘটায়।
(৩) ঘটনাসমূহের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কখনো ঘটে না।

 সমাজের বিকাশে জনগণের ভূমিকা↔
মানবসমাজের প্রতিটি সদস্যই চেতনাবিশিষ্ট। তারা সঙ্কল্প নিয়ে বা আবেগ বশে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল। কিছু লক্ষ্য সামনে রেখে মানুষ কাজ করে, প্রায়ই তার ফলাফল দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অন্যরকম, অথবা যা সে চায় না। সমাজবিকাশের নিয়মগুলিকে অস্বীকার করে কোনো কিছুই ঘটে না। সমাজবিকাশে মানুষের সচেতন কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা এখানেই।

 সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতি হলো চাবিকাঠি↔
ইতিহাসের নিয়মগুলিকে বুঝতে গেলে প্রত্যেককে সমাজজীবনের সেই দিকগুলিকে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে হবে যেগুলি সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ইতিহাসের সব পর্যায়েই প্রযোজ্য। মানুষের পুনরুৎপাদন এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির সামাজিক উৎপাদন উভয়ই হলো মানুষের কাজ যা সর্বযুগেই মানুষের সমাজে প্রত্যক্ষ করা গেছে। পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া যেহেতু জৈবিক সেহেতু এটা নির্ধারক নয়। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক উৎপাদনের বিশ্লেষণ থেকেই ইতিহাসের মূল নিয়মগুলি জানা যেতে পারে। ‘‘সুতরাং প্রাণ ধারণের আশু উপকরণের উৎপাদন এবং যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হলো সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। আইনের ধ্যান ধারণা, শিল্পকলা এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত।’’ (এঙ্গেলস)
নিজের প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করে ও তাকে রূপান্তরিত করে। একেই বলে উৎপাদন। সামাজিকভাবে উৎপাদন। সামাজিক উৎপাদন। হাতিয়ার এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত। হাতিয়ারকে ব্যবহার করে উৎপাদন প্রক্রিয়া শ্রমের প্রয়োগে সফল হয়েছে। শ্রম ও তার প্রয়োগ এবং হাতিয়ারের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকশিত হয়েছে। উন্নত হয়েছে মস্তিষ্ক। উদ্ভাবিত হয়েছে বাক্‌যন্ত্র।
সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
(১) মানবশ্রম; (২) প্রকৃতি (জমি, কাঁচামাল প্রভৃতি); (৩) উৎপাদনের উপকরণ (হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, শক্তি প্রভৃতি) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানও শ্রমের উপকরণ। এগুলি সবই উৎপাদিকা শক্তির অন্তর্গত।
সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। উৎপাদনের উপকরণকে ঘিরে যে সম্পর্ক সেইগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এইগুলিকে বলে উৎপাদন সম্পর্ক।
উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক যৌথভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে।
বাস্তব জীবনই সমাজের ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তোলে।
মানুষের সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটে চলে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের ধারণা এবং জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে।
বাস্তবজীবনকে ভিত্তি করে যেমন ধারণা গড়ে ওঠে ও তার বিকাশ ঘটে, একবার ধারণা গড়ে ওঠার পর তা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়। সমাজের বিকাশ ধারাকে এই ধারণা বা চেতনা প্রভাবিত করে।
সমাজবিকাশের ধারায় একসময়ের নতুন চিন্তা পরবর্তী সময়ে পুরানো চিন্তায় পরিণত হয়।
প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা
প্রগতিশীল চিন্তা
এই দুই চিন্তার সংঘাত সব সময়েই বিদ্যমান। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে এই চিন্তা জগতের সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। নচেৎ বিপ্লবী সংগ্রাম অগ্রসর হবে না।
ধর্ম—ধর্মকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। উল্টানো জগৎচেতনাকে অবলম্বন করেই ধর্মের উদ্ভব। কয়েক হাজার বছর ধরেই মানব সমাজে ধর্মের অস্তিত্ব। নানা রূপের ধর্ম। তবে সমস্ত ধর্মের ভিত্তি হল ভাববাদী দর্শন। পরজন্ম, পূর্বজন্ম এগুলি ধর্মীয় ধারণা। ইতিহাসে দেখা গেছে শোষকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। মার্কস যেমন ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করেছেন, আবার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যখন ধর্মবিশ্বাসগুলি গড়ে উঠেছিল তখন সেই ধর্মবিশ্বাসগুলি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল—এই কথাও উল্লেখ করেছেন।

 শোষণ↔
মানব সমাজের বিকাশের ধারায় শোষণভিত্তিক সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে। উৎপাদনের হাতিয়ার যখন ছিল অনুন্নত, মানবসমাজ যখন পশ্চাদপদ অবস্থায় ছিল তখন মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা শুধুমাত্র নিজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল না। মানুষ তখনও নিজের প্রয়োজন পূরণ করে কিছুটা হলেও বাড়তি উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করেনি। সেই অবস্থায় মানব সমাজে শোষণের ভিত্তিও ছিল না। তাই সেই স্তরে শোষণ ছিল না। যখন উৎপাদনের বিকাশের ধারায় মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণ করে কিছুটা হলেও বাড়তি উৎপাদন করতে সক্ষম হলো তখনই সমাজে শোষণের ভিত্তি গড়ে উঠল। বাড়তি উৎপাদন অাত্মসাৎ করার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শোষণ দেখা দিল।

 শোষণকে ভিত্তি করেই সমাজে দেখা দিয়েছে↔
শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম
উৎপাদনে উপকরণের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণী গড়ে ওঠে। উপকরণের মালিক হল শোষকশ্রেণী। বাকিরা শোষিতশ্রেণী।
অন্যান্য সমস্ত পরিচয়ের গুরুত্ব রয়েছে। তবে শ্রেণীপরিচয় হলো মৌলিক।

 রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম↔
শ্রেণীসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো শোষক শ্রেণীর চিন্তা, ধারণা এবং তত্ত্বের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম।
আবার শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধিতে বিপ্লবী সংগ্রাম শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয় না। এই লড়াই রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিচালিত হয়। কারণ যে কোনো বিপ্লবের প্রধান বিষয় হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন।
শ্রেণীসংগ্রাম সবসময়ই অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়।
ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়ম—উপলব্ধি ও প্রয়োগ—অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

 উৎপাদন ব্যবস্থা↔
উৎপাদিকা শক্তি ও সেইসাথে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক উৎপানের চরিত্রের ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাঠামোকে উৎপাদন ব্যবস্থা বলে। একেই বলে সমাজের ভিত্তি বা কাঠামো। মানবসমাজের বিকাশধারাকে বুঝতে হলে এই ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে হবে। সমাজজীবনের অন্য সমস্ত দিকগুলি রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, মতাদর্শ, সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিক রীতি এবং মূল্যবোধ এই সমস্ত কিছু অর্থনৈতিক কাঠামোর থেকে উদ্ভূত। এইগুলিকে উপরিকাঠামো বলে।

 ভিত্তি ও উপরিকাঠামো↔
— পারস্পরিক সম্পর্ক — দ্বান্দ্বিক চরিত্রের। ভিত্তিকে অবলম্বন করে উপরিকাঠামো গড়ে উঠলেও উপরিকাঠামোও ভিত্তিকে প্রভাবিত করে।

 সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন↔
ভিত্তি ও উপরিকাঠামো এবং এদের ওপর আরোপিত সমাজজীবন মিলিতভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন সম্ভব করে।

 মানবসমাজে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন—↔
(১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ
(২) দাস সমাজ
(৩) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ                               শোষণভিত্তিক সমাজ
(৪) পুঁজিবাদী সমাজ
(৫) শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ

 উৎপাদিকা শক্তি ধারাবাহিকভাবে বর্ধমান↔
 উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলেই উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন↔
 সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে মৌলিক দ্বন্দ্ব —↔
উৎপাদিকা শক্তি বনাম উৎপাদন সম্পর্ক—শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ।
 সমাজবিকাশের চালিকা শক্তি শ্রেণীসংগ্রাম↔

 রাষ্ট্র ও বিপ্লব↔
মানব সমাজের বিকাশের ধারাতেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব। চিরকাল ছিল না। মানব সমাজ যখন অমীমাংসেয় শ্রেণীসংগ্রামে জড়িয়ে পড়ল, তখন সেই শ্রেণীসংগ্রামকে শোষকদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্য একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হল। রাষ্ট্র সেই যন্ত্ররূপে আবির্ভূত হল। যবে থেকে সমাজে শ্রেণী বিভাগ ও শোষণ দেখা দিল, তবে থেকেই মানবসমাজে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। রাষ্ট্রের রূপের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। দাস রাষ্ট্র, সামন্ত রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র,  সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ‍‌নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রের রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। এক ধরনের রাষ্ট্র থেকে আর এক ধরনের রাষ্ট্রের ক্ষেত্র সমাজ বিপ্লব ধাত্রীর ভূমিকা পালন করেছে।
 সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব↔
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানব সমাজের বুক থেকে শোষণ ব্যবস্থার চিরতরে অবসান ঘটাবে। বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি বিপ্লব হলেই সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় বোঝায় না। বিপ্লব পরবর্তী সর্বহারার রাষ্ট্রকে রক্ষা করার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোনোরকম  অসতর্কতা থাকলে প্রতিবিপ্লবীরা তা ব্যবহার করবে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিকাশ ঘটানো এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য সঠিক ধারায় পরিচালনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

 সমাজতান্ত্রিক সমাজ—কয়েকটি কথা↔
রাজনৈতিক রূপ—সর্বহারার রাষ্ট্র।

 অর্থনৈতিক রূপ—উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা↔
সমস্ত কিছুই সমাজের সম্পত্তি। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানা নয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছাড়াও যৌথ সমবায় প্রভৃতি মালিকানাও সামাজিক মালিকানার রূপ হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি। পরিকল্পিত উৎপাদন। মুনাফার জন্য নয়। ‘‘কাজ অনুসারে প্রত্যেকে পাবে’’।
পশ্চাদপদ দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করার কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।
সমাজতন্ত্র যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার থেকে বহুগুণ শ্রেষ্ঠতর তা ক্রমান্বয়ে প্রমাণিত হচ্ছে। তবে কিছু নেতিবাচক ঘটনাকে আমরা বিবেচনায় রাখি।
বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত হবে। ‘‘প্রত্যেককে তার চাহিদা অনুসারে দিতে হবে।’’
জনগণের জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটে চলবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে।
সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে।
গুরুতর কিছু ত্রুটি, ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির ফলেই প্রতিবিপ্লব সফল। জোর করে এই সমস্ত দেশে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে উক্ত দেশগুলিতে গুরুতর সঙ্কট ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর হবে। যতই চেষ্টা হোক, শেষপর্যন্ত মানব সমাজের বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদের অবসান ঘটবেই। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার অনিবার্যতাকে রোখা যাবে না। বিপ্লবী ধারায় মানব সমাজ বিকশিত হবে।
ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাধারণ নিয়মগুলি শুধুমাত্র আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্টভাবে বিচার করতে হবে। সেইজন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে ভারতের সমাজবিকাশের ধারাকে অনুশীলন করতে হবে। যা পরবর্তী বিষয় হিসাবে আলোচিত হবে।